OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 465 - 474
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কাশীপ্রাপ্তি থেকে কাশী দর্শন : বঙ্গমহিলার ভ্রমণ ও অবসর ১৮৬৪-১৯৪৬

উত্তম মেইকাপ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়
Email ID : meikap.uttam15@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Anthapura, Kashiwatni, Pilgrimage, Women's Progress, Liberation, Kashidarshan, Travel, Retirement.

Abstract
In general, in patriarchal society, women are bed-mates, child-bearing mothers and caretakers of the family. But, in terms of socio-economic status, in upper- and middle-class families, women are like ornaments that have to be carefully protected in antahpur from behind the purdah of the house. Although this system is not entirely new, in Bengal in the 19th century, the control over women was imposed very strictly. And this was a sign of respect in society. In this context, women's access to the outside was limited. Sometimes she can step from the antahpura to go to her father's house, in the occasion of pooja, participate in a marriage ceremony, or take a bath in the Ganges. In a broad sense, they can spend their last few days in kashi at their death bed. In the second half of the 19th century, the advanced position of women in society became a new indicator of status in the Western educated class. As a result, the new class came forward in favor of social reform as a sign of modernity and against the practice of Sati, child marriage, polygamy, and the initiation of widow remarriage. They were also interested in women's education. Traditional conservatives in this group also gradually moved away from their positions. Although in the initial stage the progress of education among women was very slow, but it carried the taste of awareness and emancipation. They tried to go out of the traditional way and found the meaning of life. In this context, women are not going on pilgrimage just to get rid of the pain of legalities or in the hope of death in kashi. Educated women are going to holy places as pilgrims with a reformed mind in a lawful life, criticizing unreasonable rituals. Instead of kumbha joga, women are going to Allahabad and Prayag to spend their leisure time. Some women include the nearby temples in their leisurely travels. At the same time, due to the expansion of railways and the improvement of communication throughout India, places like Mathura, Vrindavan, Deoghar, Orissa, Punjab, Rameshwar, Chitrakoot, Kedarnath-Badrinath, etc. were added to their

visiting list. The architectural style and natural beauty of these places become the center of their attraction. On the other side, they questioned the rituals and hypocrisy of the priests with a rational mind. Thus, for women, the various pilgrimages become a part of pure mental satisfaction through travel rather than re-enjoyment through darshan.

Discussion

প্রখ্যাত নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক সিমন দ্য ব্যভোয়া দেখিয়েছেন নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, নারী হয়ে ওঠে।[১] সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণের মাধ্যমে 'নারী' করে তোলার অনিঃশেষ প্রক্রিয়া আজীবন চলতে থাকে।[২] পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে নিজের প্রয়োজন মতো তৈরী করে। আদিম সমাজে সম্পত্তির মালিকানা, সন্তানের পরিচয় মায়ের দ্বারাই নির্ধারিত হত। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের ধারায় পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার বদল ঘটে। নারীকে শুধু উৎপাদনের জগত থেকে নয় সন্তানের পরিচয়, সম্পত্তির মালিকানা থেকে সরিয়ে দিয়ে কেবল শ্রমিকের জোগানদাত্রী ও সেবাকারীর ভূমিকায় আবদ্ধ করা হল পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কেন নিয়ন্ত্রন দরকার তারও চলনসই ব্যাখা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তৈরী করে নেয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার নিরীখে মনু'র বক্তব্য, নারীকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধ্যকে পুত্রের অধীনে থাকার নিদান। কেন অধীনে? কেন নিয়ন্ত্রনে থাকতে হবে? কারন সে শারীরিক ও মানসিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে দুর্বল। শারীরিক কোমলতার কারনে সে কেবল গৃহ কাজের উপযোগী, ঘরের বাইরের কাজ তার জন্য নয়। মানসিক তথা চারিত্রিক কারনে নারী বহুকাঙ্খী, পাপিষ্ঠা, দুশ্চরিত্রা। তাই তাকে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এক স্বামী, পরিবার ও তার অন্দরমহলে আবদ্ধ করা হল। অবশ্য পুরুষের একাধিক বিবাহ, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এর উপর কোন বিধিনিষেধ ছিল না। আর বৌদ্ধিক দুর্বলতার কারনে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল। এই ধারনাকে আরো দৃঢ় করতে বলা হল পড়ালেখা করলে স্বামী, পরিবারের অকল্যাণ হবে। নারীর উপর এই নিয়ন্ত্রন তথা নির্মিত কাঠামো পালনের মাত্রার উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সম্মান নির্ভর করত।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের নিরিখে 'মহিলা'রা সমগোত্রীয় চরিত্রের ছিল না। জীবনযাত্রা ও বিত্তের বিচারে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন-এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।[৩] অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের কারনে নিম্নবিত্তের মহিলাদের জীবনযাত্রায় কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও স্বাধীনতার সুযোগ ছিল। উল্টোদিকে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের যৌথ পরিবারে মহিলারা আর্থিক দিক থেকে নিশ্চিত হলেও তাদের জীবন অন্দরমহলে, ঘোমটা দিয়ে পর্দার আড়ালে বন্ধ ছিল। *ঘরে বস্ত্র, অলংকার, খাদ্যাখাদ্যের কোন বিলাস-দ্রব্যের কিছুই অভাব ছিল না তবে সর্বদা ঘরে রুদ্ধ হয়ে থাকাই তাঁর ব্যবস্থা ছিল।* [৪] যেহেতু এটাই তাদের সম্মানের সূচক তাই তা পালনের ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা করত না। তাদের মহল স্পটতই অন্দর ও বাহির এই দু-ভাগে বিভক্ত থাকত। অন্দরমহলের নির্মাণশৈলী কম খোলামেলা, অনেকটা বদ্ধ। যেহেতু নারী অসূর্যস্পশ্যা তাই বোধহয় সেমহলে সূর্যের আলোও প্রবেশের অধিকার পেত না। যদিও বাড়ির পুরুষদের এমনকি দিনের বেলা স্বামীর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না, দৈবাত হলে দূর থেকে বড়ো ঘোমটা দিয়ে মহিলারা নিজেদের লুকিয়ে নিতেন। কিছুটা পরে হলেও নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী প্রকাশ্যে জানান কঠোর পর্দা প্রথার কারনে বঙ্গমহিলারা শুধু লেখপড়া থেকে বঞ্চিত হন না, তাদের মানসিক বিকাশও ঘটে না।[৫] অনেক বাড়িতে তো শাশুড়ি, বয়োঃজ্যেষ্ঠ মহিলাদের সামনেও ঘোমটা দিয়ে থাকতে হত। এই ব্যবস্থা এতটাই গভীরে প্রোথিত ছিল যে রাসসুন্দরী দেবী তো স্বামীর ঘোড়া দেখেই ঘোমটা টেনে লুকিয়ে পড়েন।[৬]

বঙ্গমহিলার চৌকাঠ পেরোনোর সুযোগ :

এহেন কঠোর নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থায় চৌকাঠ পেরোনোর সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। কমবয়সী মহিলারা বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় অন্তঃপুর থেকে বেরোনোর সুযোগ পেতেন। এছাড়া আত্মীয় বাড়িতে পূজা-পার্বণ, বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে বাইরের জগতকে দেখতে পেতেন।[৭] সাধারণত বয়স্ক মহিলারা গঙ্গা স্নানে যেতেন। এছাড়া শেষ বয়সে কাশী বিশ্বনাথের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চরণে আশ্রয় নিতেন বিধবারা। 'ময়মনসিংহের বারেন্দ্র জমিদার'এ সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন নারায়নী দেবী নয় বছর কাশীধামে থাকেন এবং ১২৪৬ সালের ২৪শে বৈশাখ ছিয়াশি বছর বয়সে কাশীপ্রাপ্তি লাভ করেন। একই ইচ্ছায় শ্যামাসুন্দরী দীর্ঘকাল কাশীতে বসবাস করেন। চন্দন নগরের নৃত্যগোপাল শেঠের দ্বিতীয়া স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী স্বামী গত হওয়ার পর জীবনের দশ বারো বছর সামান্য বেশে বিভিন্ন তীর্থে ঘুরে বেড়ান। শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাশিপ্রাপ্তির আশা পূরনের জন্য ছেলেরা বাড়িও কিনে দেন কাশীতে। ১৩৩৫ সালের ৬ই ফাল্গুন সামান্য রোগভোগের পর তিনি কাশীলাভ করেন।[৮] এভাবে আঠারো-উনিশ শতকের অনেক মহিলা শেষ আশ্রয় স্থলে যাওয়ার মাধ্যমে অন্তঃপুরের পিঞ্জর থেকে বেরোনোর সুযোগ পেতেন। এই সামান্য বেরোনোর পরিসরে মহিলারা কোনো ভাবেই পর্দা, ঘোমটা সরাতে পারতেন না। পাল্কির ঘেরাটোপে যেটুকু দেখতে পেতেন সেটাই তাদের কাছে ছিল বড়ো প্রাপ্তি।

আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা সহ অন্যান্য গিন্নিরা গঙ্গা স্নানে যেতেন অতি ভোরে যখন রাস্তায় লোকজন কম। এবং বেহারারা পালকি সহ ডুবিয়ে গঙ্গা স্নান করাতেন।[৯] যে কারনেই মহিলারা অন্তঃপুর থেকে বের হোক না কেন তাঁরা সদর দরজা দিয়ে যেতে পারতেন না। বিকল্প দরজা দিয়ে পরিবারের চোখের আড়াল দিয়ে যেতে হত। স্মৃতি মিত্র দেখিয়েছেন বাড়ির মহিলাদের জন্য আলাদা দরজা ছিল, এমনকি যে গাড়িতে যেতেন সেটাও চালকের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য পর্দা ঘেরা থাকত।[১০] সমাজের এই চিত্র সাহিত্যের পাতায়ও ধরা পড়ে। যেমন বৃষবিক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখী বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর চাকর বাকর সহ সবাই পথেঘাটে যে মহিলাকেই দেখে তাকেই ধরে আনে যেহেতু চাক্ষুষ কেউ দেখেনি। ফলে বেশ কয়েকদিন মহিলাদের বাড়ি থেকে বেরানো দায় হয়ে যায়।[১১] আবার জ্ঞানদাকে সত্যেন্দ্রনাথের সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেও জাহাজঘাট পর্যন্ত পাল্কিতেই যেতে হয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি :

উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে সার্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতি মহিলাদের কেবলমাত্র পর্দা সরিয়ে, চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে আসার পথ প্রশস্ত করেনি, মনের পর্দা সরিয়ে বাইরের জগতকে নতুন ভাবে দেখতেও সাহায্য করে। উচ্চবর্গের মহিলাদের জীবনের সিংহভাগ কেটে যেত অন্তঃপুরের অন্তরালে রাঁধার পরে খাওয়া, খাওয়ার পরে রাঁধার আয়োজন করতেই।[১২] শেষ বয়সে কেউ রোগ সারাতে, কেউ বা কাশীধামে গঙ্গা প্রাপ্তির আশায় তীর্থ ভ্রমণে যেতেন। এখানে তাদের মধ্যে ঈশ্বর মাহাত্ম্য, ভক্তিভাবই শেষ কথা ছিল। কিন্তু শতকের শেষ দিক থেকে দেখা যাচ্ছে মহিলারা যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তীর্থস্থান গুলিতে যাচ্ছে। যেখানে রয়েছে পুণ্যলাভের মোহের বদলে নতুনকে দেখার অপার আগ্রহ। তাইতো সে ভ্রমনে যাচ্ছে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সময়ে, অবসর সময়ে। এই মানসিকতা বদলের সূচনা হয়েছিল নারী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকারের মাধ্যমে। বঙ্গদেশে নারী শিক্ষার সূচনা করেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। তবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রাহ্মনেতা, শিক্ষিত প্রগতিশীল এমনকি রক্ষণশীল হিন্দু স্বামী ও পিতারা নিজেদের প্রয়োজনে নারীশিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। তবে তাঁরা উপলব্ধি করেন নারীশিক্ষা প্রসারের, মানসিক বিকাশের বড়ো অন্তরায় পর্দাপ্রথা। এক্ষেত্রে ১৮৬০ এর দশক থেকে এই প্রথা দূরীকরণে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীর ভূমিকায় এগিয়ে এলেন কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন ঘোষ, দূর্গামোহন দাস, শশিপদ ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখগন।

কেশবচন্দ্র সেন নারী প্রগতির পথ প্রদর্শক রূপে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রগতিশীল নব্য শ্রেণীর কাছে স্ত্রী আর অধীনস্ত দাসী নয়, বরং সঙ্গী ও সহযোগী বটে। এই ভাবনা থেকে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মতো সাফল্যমণ্ডিত ঘটনার সাক্ষী করতে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলেন। রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও সমূহ বাধা উপেক্ষা করে তাঁকে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। নারী প্রগতির অন্যতম অগ্রদূত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে প্রাণে স্ত্রীকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চাইলেও পিতার আপত্তিতে তা হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে দেশের প্রথম সিভিল সার্জেন্ট রূপে তিনিই প্রথম স্ত্রী জ্ঞানদাকে কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে নিয়ে যান। তাছাড়া মহিলারা যে পোশাক পরতেন তা বাইরে বেরোনোর উপযোগী ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ দর্জি এনে পার্সি অনুকরণে শুধু জ্ঞানদার জন্য পোশাক তৈরী করলেন না। এই শাড়ী পরার কৌশল সমগ্র নারী সমাজের বাইরে বেরোনোর একটা বাধা কাটিয়ে উঠার সহায়ক হয়ে উঠে। ১৮৬৬ সালে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাখাল ও বিহারীলাল তাদের স্ত্রীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরান। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে মিস কারপেন্টারের সভায় পুরুষদের সাথে মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭১ সালে কেশবচন্দ্র সেনের সভায় অ্যানেট অ্যাক্রেড সহ বেশ কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শুধু ব্রাহ্ম নয় ঐতিহ্যিক হিন্দু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৫ সালে তাঁর বাড়িতে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস এর সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন এবং অন্তঃপুরেই বাড়ির মহিলারা তাকে সম্মান জানান।[১৩]

পুরুষদের পাশাপাশি প্রগতিশীল মহিলারাও উপলব্ধি করলো চিরাচরিত ভূমিকার বদলে জীবনের ভিন্ন সংজ্ঞা। তারা আরো বেশী করে সামাজিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ জন মহিলা পর্দার আড়াল থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ শোনেন। ঐ বছরই ব্রহ্মময়ী দেবী বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে পুরুষদের সাথেই অংশগ্রহণ করেন। ১৮৭২ সাল থেকে ব্রাহ্ম মহিলারা স্বামীর সাথেই উপাসনায় বসার দাবী জানান। প্রথমে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন আপত্তি করলেও পরে তাদের এই দাবী মেনে নেন। ব্রাহ্মমহিলারা কেবল উপাসনা অনুষ্ঠান নয় আরো বেশি নারীকে এগিয়ে আনতে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ব্রাহ্মিকা সমাজ, বামাহিতৈষিনী সভা, বঙ্গমহিলা সমাজ, সখি সমিতি প্রভৃতির সমিতিগুলি মহিলাদের সার্বিক উন্নতিতে এগিয়ে আসেন। অন্তঃপুর এর বাইরে মহিলাদের অংশগ্রহণ যেখানে নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে তাঁরা ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে সমানভাবে পা ফেলতে শুরু করেন এই প্রচেষ্টা গুলির মাধ্যমে।[১৪]

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে মহিলারা কেবল উপাসনা, সামাজিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আশার পাশাপাশি নিজের চোখে বৃহত্তর জগতকেও দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে রেলপথের প্রসার হেতু যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল প্রগতি তাদের এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার পথ প্রশস্ত করে। এই সময় চাকুরিসূত্রে সত্যেন্দ্রনাথের মতো পুরুষরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত শুরু করেন। অনেকে দেশ ভ্রমণের ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়েন। নিয়মিত তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মহিলারাও কিন্তু পিছিয়ে রইলো না। স্বামী তাঁর বন্ধুর সাথে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বর্ণনা স্ত্রী বামাসুন্দরীকে জানালে তাঁর প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন, "লিপিখানি পাঠ করিতে করিতে যে কত অশ্রুপাত হইল, তাহা আর কী লিখিব মহাশয় জানি না সে আনন্দাশ্রু না বিষাদাশ্রু আপনারা মুঙ্গেরে গিয়া নানাপ্রকার রমণীয় পদার্থ সকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেছেন শিববাবু আমরা দেখিতে তো পাইবই না, মনুষ্যের একটা আশা থাকে তাহা আমাদের নাই..."।[১৫] এটা তো অনেক বড়ো চাওয়া অন্তঃপুরে বদ্ধ থেকে গঙ্গার উপর পুল তৈরি হওয়ার কথা শুনলেও নিজের চোখে দেখতে না পাওয়ার আফসোস জানিয়ে মায়াসুন্দরী বঙ্গমহিলা পত্রিকায় চিঠি লেখেন।[১৬] প্রথম দিকে মহিলারা রোগ সারাতে বা গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায় শেষ জীবনে কাশীবাসী হতেন। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তাঁরা শেষ বয়সের আগেই তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়লেন। অনেকে বইতে পড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে চাক্ষুষ করতে বেরিয়ে পড়েন। রেলপথের প্রসার ছাড়াও সুয়েজ খালের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয়দের কাছে ইউরোপের দূরত্বও কমিয়ে দিল। ফলত পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও সত্যি সত্যি বিদেশ পথের যাত্রী হয়ে ওঠেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৮৬৪ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তীর্থস্থান কেন্দ্রিক ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের কাছে ক্রমশ কিভাবে তীর্থক্ষেত্রের সংজ্ঞা ও যাওয়ার উদ্দেশ্যে বদল ঘটছে। এই পরিবর্তনের ধারায় মহিলারা কীভাবে নিজেদের নতুনভাবে খুঁজে পাচ্ছে তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি :

এই প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রথাগত গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে প্রাথমিক উপাদান পড়েছি। এক্ষেত্রে সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী, সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মহিলাদের রচনা, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা প্রভৃতি প্রাথমিক উপাদান ও প্রাসঙ্গিক গৌণ উপাদানের নিবিড় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে মহিলাদের চোখে তীর্থস্থানের ধারনা, যাওয়ার উদ্দেশ্য বদল এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছি।

রমাসুন্দরীর চোখে কাশী :

সাধারণত বিধবা মহিলারা শেষ বয়সে তীর্থে যেতেন গঙ্গা প্রাপ্তির আশায়। আবার অনেকে বেঁচে থাকতে অন্তত একবার কাশী-বারানসী যেতেন। ভক্তিভাবে তাদের কাছে ঈশ্বর মাহাত্ম্যই মুখ্য ছিল। তবে নারী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে মহিলাদের

মধ্যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রসার ঘটে। তাঁরা কাশী-বারানসী গেলেও আর অন্ধভাবে সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা না দেখে আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করতে শুরু করেন। যেমন রমাসুন্দরীর কাশী দর্শন ১৮৬৪ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় বামাগণের রচনা বিভাগে প্রকাশিত হয়। এটি পদ্যাকারে হলেও মহিলা রচিত প্রথম ভ্রমণ বর্ণনা। তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে ব্যতিক্রমী ভাবনা ফুটে ওঠে। তবে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এমন ব্যতিক্রমী ভাবনাই সঙ্গত ছিল। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় কন্যার জন্মকে পরিবারের ও পিতার অমঙ্গলের সূচক মনে করা হত। যা ফুটে ওঠে তাকে প্রতিপালনের প্রতিটি পর্যায়ে। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষিত, চাকুরিজীবি স্বামীরা সভ্যতার মাপকাঠিতে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, শিক্ষাদানে এগিয়ে আসেন। প্রথমেই তাঁরা কিঞ্চিত শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদের স্ত্রীদের নিজেদের উপযোগী করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই পরিস্থিতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়া শিক্ষাও নতুন পাত্রদের কাম্য গুণাবলী হয়ে ওঠে। পিতাদের মধ্যে কন্যার প্রতি পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গীতে বদল আসতে শুরু করে এবং শিক্ষাদানে তারাও এগিয়ে আসেন। নতুন এই স্বামী-পিতাদের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরাই এগিয়ে ছিলেন। রমাসুন্দরীর পিতা শিবচন্দ্র দেব একাধারে সাধারন ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য, অন্যদিকে ডিরোজিও'র অনুগামী। স্বামী সাধারন ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, পেশায় শল্য চিকিৎসক। এবং বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের অন্যতম নেতা মহেন্দ্রলাল সরকারের সাথে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। ভগ্নীপতি ছিলেন জনপ্রিয় 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এমনিই এক উচ্চ পারিবারিক পরিবেশে থাকার ফলে রমাসুন্দরী মনের দিক যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। প্রথমে পিতার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নারী সমাজের উন্নতির প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। তাইতো তিনি বঙ্গমহিলা সমাজ, সখি সমিতিতে যোগদানের মাধ্যমে সামাজিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন।[১৭] এহেন ব্যক্তিত্বের অধিকারী রমাসুন্দরীর কাশী-বারানসী দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনায় কোথাও ভক্তির প্রাবল্য নেই। রমাসুন্দরীর ভাবনায় যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তী সময়কালে লক্ষ্মীমণি দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রত্নমালা দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, গিরিবালা দেবী, অম্বুজা সুন্দরী, হিরণ্ময়ী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, বনলতা দেবী, নীলিমাপ্রভা দত্ত, নিরূপমা দেবী প্রমুখদের ভ্রমণ বর্ণনায় ফুটে ওঠে।

কাশী :

রমাসুন্দরী যে যুক্তিবাদী মন নিয়ে কাশী দেখেছেন সেই ধারা পরবর্তী কালের মহিলাদের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান ছিল। তাঁরা কাশী-বারানসী যাওয়াকে তীর্থযাত্রার পরিবর্তে অন্যান্য ভ্রমণ স্থানের মতো দেখছেন। যেমন লক্ষ্মীমণি দেবী ১২৭৭ ব. (1877 খ্রি.) ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। *মাঘের প্রথম ভাগে আনন্দিত চিতে। বাষ্পরথে চলিলাম বিদেশ ভ্রমিতে।* তৎকালীন সময়কালে মহিলাদের বাড়ির বাহিরমহলে আসা একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। তাইতো লক্ষ্মীমণির কাছে এই যাওয়া বিদেশ ভ্রমণের সমান। এই ভ্রমণ পর্বে প্রথমে তিনি কাশী দর্শনে গেলেও সেখানকার পরিবেশ চাক্ষুষ দেখে একেবারে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অতি কষ্টে মাত্র দু'দিন থেকে প্রয়াগের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। প্রয়াগে ঐ বছর কুম্ভযোগ ছিল। তাঁর সাথে আগত সঙ্গীরা পূর্ণ পুণ্যলাভের আশায় মাথা মুড়িয়ে কুম্ভ স্নান করেন। বিধবা লক্ষ্মীমণিকে তাঁর সঙ্গীরা এভাবে স্নানের অনুরোধ করলেও তিনি তা করেননি। পরের দিনই তিনি ঐতিহাসিক আগ্রা নগরীতে যান। সেখানে তাজমহল ও তার পারিপার্শ্বিকের শোভা দেখে আনন্দিত হন। এখান থেকে মথুরা বৃন্দাবন যান। একদিকে বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের ব্যবহারে রুষ্ট, আবার এখানকার সৌন্দর্যে অভিভূত। কানপুর থেকে গয়া হয়ে তাঁর ভ্রমণ শেষ করেন। এই ভ্রমণে পুণ্যলাভের ইচ্ছার বদলে মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রকৃতির অপরূপ রূপে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন।[১৮]

প্রিয়ম্বদা দেবী'র বারানসী ভ্রমণের কথা ভারতী পত্রিকার ১৩০৭ ব. ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *পূজার ছুটি- অসংখ্য যাত্রী বৎসরান্তে কম্মের অবসরে মাতৃভূমির পূন্য তীর্থ, রমণীয় নগর নগরীর সহিত ঘনিষ্টতর পরিচয়ের জন্য অগ্রসর হইয়াছে।* তবে এটা তাঁর প্রথম রেলযাত্রা নয়। এর আগেও এই পথে গিয়েছেন, যার ছবি স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকলেও এবারে তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তা মিলিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। দশমীর দিন পৌঁছে নৌকা করে প্রতিমা বিসর্জন, কাশীর বিভিন্ন মন্দির, স্থাপত্য কর্ম, বিশ্বনাথ মন্দিরে আরতি, মণিকর্ণিকা ঘাট, সারনাথের বৌদ্ধ মন্দির, পাশের জৈন মন্দির, দুর্গা বাড়িতে রানী ভবানীর কীর্তি, কাশীর দ্বারপাল-কালভৈরব মন্দির, বালগোপালের মন্দির ও তার বৃহৎ কক্ষে সঙ্গীত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসরের রসস্বাদন করে কাশী দর্শন শেষ করেন। একদিকে তিনি বিভিন্ন স্থাপত্য কর্ম দেখে মুগ্ধ হন। অন্যদিকে বিশ্বনাথ মন্দিরে, দুর্গা বাড়িতে পান্ডাদের মধ্যে অর্থলিপ্সা, ভক্তি ভাবের অভাব দেখে আশাহত হন। *কিন্তু এ অভিনয় মাত্র, ভক্তি এবং অনুতাপ দুয়েরই অভাব। -কিন্তু ভক্ত যে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আপনার প্রিয় দেবতার অর্চ্চনা করে, মুখে সে আনন্দের ভাব নাই, এ কেবল বেতনভোগীর নিত্য কর্ম্ম। কোথায় সে উচ্ছ্বসিত প্রীতি, আত্মবিস্মৃত ভক্তি, একমাত্র যাহাই কেবল দেবযোগ্য উপহার-এবং যাহা দেখিয়া আপন হৃদয়কে ভক্তিনম্র করিয়া লইবার আশায় এত দূর এত আগ্রহে আসিয়াছিলাম।* [১৯]

এলাহাবাদ :

কাশী-বারানসীর পর অন্যতম পুণ্যক্ষেত্র এলাহাবাদের প্রয়াগ। এখানে ত্রিবেনী সঙ্গমে কুম্ভযোগের সময় স্নান করে পাপের স্খলন ও পুণ্য অর্জনের জন্য অনেকেই আসেন। তবে স্বর্ণকুমারী দেবী কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ দেখে নয়, পূজার ছুটিতে তিনি এলাহাবাদ তথা প্রয়াগের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যেহেতু তীর্থক্ষেত্র তাই জনপ্রিয় স্থান যেমন নৌকা চড়ে ত্রিবেণী সঙ্গম, সম্রাট আকবর নির্মিত দুর্গ, অক্ষয় বট, বেণীঘাট, বড়ুয়া ঘাট, শ্যামা মায়িজি মন্দির, পাহাড়ের উপর কৃষ্ণ-রাধার মন্দির, শিব মন্দির, ভরদ্বাজের আশ্রম মন্দির, রাজার মন্দির, শিউকোটির মন্দির সবই দেখেছেন। কিন্তু যখনই সেখানকার নিয়ম কানুন তাঁর শিক্ষিত মনে প্রশ্ন তুলেছে তখনই তিনি তাঁর সমালোচনা করেছেন। যখন শুনলেন শুধু স্নান নয়, পান্ডাদের কিছু দিয়ে মাথা মুড়ালে তবেই পূর্ণ পুণ্য লাভ সম্ভব তখনই সঙ্গম স্নান থেকে বিরত রইলেন। আবার একটু নির্জন স্থান থাকলেই লোকজনের মন্দির তৈরী করার প্রবণতাকে কটাক্ষ করেছেন। তেমনি ভরদ্বাজ মন্দির আশ্রমে পাণ্ডাদের অর্থ চাওয়ার দৌরাত্ম্য থেকে নিজেদের অনেক কষ্টে ফিরে আসার কথা তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।[২০] রত্নমালা দেবী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের তীর্থস্থানকে দেখার নেশায় কখনো সঙ্গীদের সাথে, কখনো একাই বেরিয়ে পড়েছেন। এমনই ভ্রমণের ইচ্ছায় ১৯২৪ সালে অর্ধকুম্ভ যোগের সময় প্রয়াগে যান। তিনি এই সময়কার প্রয়াগের সামগ্রিক বর্ণনা দিয়েছেন।[২১]

মথুরা-বৃন্দাবন :

বনবাসিনীর পত্র শিরোনামে বামাবোধিনী পত্রিকায় একটি ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যায়। নাম উল্লেখ না থাকলেও এটি যে কোন এক মহিলারই ভ্রমণ বৃত্তান্ত তা বোঝা যায় এই উদ্ধৃতি থেকে *আমরা দুই সঙ্গিনীতে মিলিয়া মথুরা হইতে মধুবনেই যাত্রা করিলাম।* বৃন্দাবনে চব্বিশটি বনে প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসে বনভ্রমনে যান যাত্রীরা। তারাও এর অংশ হিসেবে মধুবন যাত্রা করেন। মধুবনে বৃক্ষ শোভিত কুন্ডের ধারে বসে তাদের কেমন একটা অপূর্ব ভাবে হৃদয় মুগ্ধ হয়। আবার একইসাথে গ্রামবাসীদের সাহায্যের মনোভাব, আত্মমর্যাদাবোধ, আতিথেয়তায় তাঁরা আশ্চর্য।[২২]

প্রসন্নময়ী দেবী শারীরিক অসুস্থতার কারনে হাওয়া বদল তথা ভ্রমণে যান ভাইদের সাথে। এই ভ্রমণকালে মথুরা ও বৃন্দাবনে যান। রেলপথে মথুরা যাওয়ার অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর না হলেও পথের অপূর্ব দৃশ্যে তিনি মোহিত হন। মথুরায় উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হল মথুরানাথের মন্দির, বিশ্রামঘাটের আরতি। তাই সন্ধ্যার আগেই আশেপাশের দেখার জায়গা তথা কংসখেড়া, রণভূম, রঙ্গেশ্বর মহাদেও, সতীমঠ এগুলি দেখেন। সহযোগী পান্ডার কাছে এবিষয়ে যা শোনেন তাঁর সাথে বাস্তবের তেমন মিল খুঁজে পাননি। তবে তিনি মথুরানাথ মন্দিরের কীর্তনে, বিশ্রামঘাটের আরতিতে মুগ্ধ। *এই সব দৃশ্য একত্র অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে এবং আশা-নৈরাশ্যে কেমন যে হইয়া গেল, তাহা বলিতে পারি না।* এরপর তিনি মথুরা থেকে বৃন্দাবন পৌঁছান, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধুরিতে আচ্ছন্ন হন। দর্শনীয় বিভিন্ন মন্দির ছাড়াও সোনার তালগাছ দেখে শৈশবের স্মৃতিতে ডুব দেন। তবে তিনি যে ভিখারীদের ভিক্ষা চাওয়ার কৌশলে ক্ষুব্ধ তাও উল্লেখ করেছেন।[২৩]

উড়িষ্যা :

গিরিবালা দেবী নৌকায় চড়ে মহানদী নদীর দু পাশের শোভা ও মন্দির দেখতে ১৩০১ সালের ৯ই অগ্রহায়ন যাত্রা শুরু করেন। তিনি এই যাত্রা পথে মূলত নদী সংলগ্ন কটক এর বিভিন্ন স্থান পাহাড় ও মন্দিরগুলি দেখেছেন। যদিও উড়িষ্যা জগন্নাথ দেবের জন্য সুপরিচিত তবে এখানে তিনি বেশীরভাগই মাহাত্ম্যের কারনে বিভিন্ন নামের শিবমন্দির দেখার বর্ণনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিয়েছেন। যার মধ্যে ধবলেশ্বর, মঞ্চেশ্বর, বিরিঞ্চীশ্বর, পশ্চিমেশ্বর, বৈদ্যনাথ, রামনাথ ও সিংহনাথের মন্দির দেখেছেন। মন্দির গুলির বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও বিশেষ দিকেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন ধবলেশ্বর মন্দিরে ভক্তের প্রতি পান্ডার দুর্ব্যবহার বা পশ্চিমেশ্বর মন্দিরের বিশেষত্ব। পশ্চিমেশ্বর শিব মন্দিরে ব্রাহ্মনের পরিবর্তে মালী পৌরহিত্যের কাজ করেন। তবে আরো আশ্চর্যের বিষয় এই মন্দিরে মহাদেব সকাল, দুপুর সন্ধ্যায় ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হওয়াকে লোকেরা দেব মাহাত্ম্য মনে করেন। গিরিবালা দেবী উল্লেখ করেছেন আসলে এটা মন্দিরে অবস্থান অনুযায়ী সূর্যালোকের বিকিরনের কারনে রঙের পরিবর্তন। এই মন্দিরগুলি বেশিরভাগই পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। তবে তাঁর মন পাহাড়ের সৌন্দর্যে বেশী আচ্ছন্ন - *যে দিকেই নিরীক্ষণ করি সে দিকেই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মন প্রাণ বিমোহিত হইতে লাগিল*। তাঁর দেখা পাহাড় গুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাপর্বত, ত্রিগিরি, হাতিমুন্ডিয়া। হাতিমুন্ডিয়া পাহাড়ে উঠে মনে হয়... *শিরোদেশে পৌছিয়া যে সকল দৃশ্যাবলী আমাদের নয়ন পথে পতিত হইল, তাহাতে আমাদের সকল ক্লান্তি দূরীভূত হইল।* এভাবে তিনি পনের দিন ধরে কটকের বিভিন্ন প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করেন।[২৪]

অম্বুজা সুন্দরী অল্প বয়স থেকেই নিয়মিত বামাবোধিনী, সাহিত্য, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। লেখার গুনমানের জন্য কুন্তলীন পুরষ্কারও পেয়েছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে তাঁর একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। হিন্দুদের কাছে পবিত্র চারধাম তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে জগন্নাথ ধাম-পুরী অন্যতম। তিনি তাঁর বিবরণে এই তীর্থস্থানের তথ্য সমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া চন্দনতলার চাপ নামে পরিচিত মদনমোহনের জলক্রীড়া অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫]

ব্যান্ডেল গির্জা :

স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে হিরণ্ময়ী দেবী'র ইচ্ছা ছিল খ্রিস্টানদের উপাসনা পদ্ধতি দেখার। *রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতি অনেকটা আমাদের মতো শুনিয়া অনেক দিন হইতে তাহা একবার দেখিবার সাধ ছিল।* তাই তিনি ভারতের প্রথম চার্চ ব্যান্ডেল গির্জা দেখতে যান। এই অভিজ্ঞতা ১২৯৫ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গির্জার আলোকময় সজ্জা, ব্যান্ডের আনন্দময় সুরে অভিভূত হয়ে ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করেন। তবে তিনি গির্জার উপাসনা পদ্ধতি, বিশেষত স্বীকারোক্তি অনুষ্ঠানটিকে মেনে নিতে পারেননি। সার্বিকভাবে তিনি উৎসবের সাজসজ্জার থেকে হৃদয়স্পর্শী গানের সুরে বেশি মুগ্ধ। এছাড়া ফেরার সময় রাতের আকাশে চাঁদের শোভা, গঙ্গার জলে জ্যোৎস্না আলোর খেলা দেখেও যে আনন্দিত তা তাঁর বর্ণনায় ফুটে ওঠে।[২৬]

দেওঘর :

গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। *জাহ্নবী* পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন। অনেক গ্রন্থও রচনা করেন। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে দেখা যায় তিনি মধুপুর বেড়াতে গিয়ে বৈদ্যনাথ মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। মন্দিরে পান্ডাদের অর্থ উপার্জনের কৌশল বিরক্ত হলেও তাদের আত্মীয়তায় যে তিনি তুষ্ট হয়েছিলেন তাও উল্লেখ করেন। তবে তাঁর থেকেও বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন পালকি করে যাওয়ার সময় আশেপাশের দৃশ্যে... বলিতে পারি না সেই নারিকেল কুঞ্জ, কি সেই পর্ণকুটীর, কি গাভী-গল ঘণ্টা ধ্বনি, কি সেই শষ্পবীথিকা, কে সেখানে আমার মন হরণ করিয়াছিল?[২৭]

জ্বালামুখী :

বনলতা দেবী (শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) পিতার তত্ত্বাবধানেই শিক্ষালাভ করেন। পিতার সমাজকল্যানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে তিনি সুমতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বিয়ের পর স্বামী শশী ভূষণ বিদ্যালঙ্কারের সাথে একযোগে সমাজ সংস্কারমূলক কাজেও অংশগ্রহণ করেন। বনলতা দেবী পাঞ্জাবের হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে যান। সেখানে গিয়ে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ স্থান নামে পরিচিত জ্বালামুখী'র প্রকৃত সত্যতা তাঁর ভ্রমণ বর্ণনায় উল্লেখ করেন। আসলে এটি একটি পাহাড় যেখান থেকে ক্রমাগত অগ্নুৎপাত হয় অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি। কিন্তু অজ্ঞতা বশত হিন্দুরা এটিকে ঈশ্বরের বিস্ময়কর সৃষ্টি মনে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে পূজা অর্চনার মাধ্যমে তীর্থস্থানের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এছাড়া এই স্থানকে কেন্দ্র করে আকবরের জন্মগ্রহণের যে কাল্পনিক গল্প রয়েছে তিনি তাঁর শিক্ষিত মন নিয়ে তাও যাচাই করেন।[২৮]

দ্বারকা, রামেশ্বর, চিত্রকূট, কেদার-বদ্রী, হরিদ্বার :

নীলিমাপ্রভা দত্ত ১৯২৪ সালের ১লা অক্টোবর দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একুশ জন সদস্য পূজার সময় রওনা হলেও শুধুমাত্র দ্বারকানাথ দর্শনই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। প্রথমে এলাহাবাদ পৌঁছে আত্মীয় বাড়িতে বিশ্রাম করেন। অল্প সময়ের জন্য এবার ত্রিবেনী সঙ্গম সহ অন্যান্য স্থান দেখতে না পেলেও তিনি আপসোস করেননি, যেহেতু আগে দেখেছেন। এখান থেকে জব্বলপুর যাওয়ার সময় ট্রেন থেকে দুধারের মনোরম পার্বত্য শোভায় মোহিত হয়েছিলেন তাঁরা। যাত্রাপথের ক্লান্তিতে লেখিকা সহ অনেকেই রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেও দলের বিধবা জ্যোতিষ ঠাকরুন লম্বা ট্রেন সফরের আনন্দ উপভোগ করেছেন জেগে থেকেই। বোম্বাই পৌঁছে গাড়ি করে, হেঁটে সমুদ্র তীরবর্তী নগরের শোভা দেখতে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা। বোম্বে থেকে দ্বারকানাথ যান দুদলে ভাগ হয়ে। এভাবে তাঁরা তীর্থযাত্রায় ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেন।[২৯] অন্যান্য তীর্থস্থানের মতো রামেশ্বর আর অদেখা রইল না। নিরূপমা দেবী রামেশ্বরে গিয়ে কিভাবে পান্ডার অর্থলিপ্সার শিকার হন সেবিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন 'তীর্থকামীর পত্রে'। শেষমেশ একপ্রকার জোরপূর্বক নিজেদের ছিনিয়ে আনেন। ব্রাহ্ম মহিলাদের পাশাপাশি নিরূপমা দেবীর মতো হিন্দু মহিলার তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের অত্যাচার নিয়ে লেখা নতুন সময়ের ইঙ্গিতবাহী।[৩০] রাধারানী দেবী পূজার ছুটিতে চিত্রকূটে বেড়াতে যান শ্বাসকষ্টের সুরাহা লাভের আশায়। সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যর্থতার পর তিনি মনে মনে অবিশ্বাসী হলেও ছোটবেলায় শোনা রামায়নের গল্পকে নিজের চোখে দেখতে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে গিয়ে বাঙ্গালী বাড়ির আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন। এক সপ্তাহ সেখানে থেকে আশেপাশের দর্শনীয় স্থান গুলি দেখেন। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ঔষধ আনতে গিয়ে দেখেন এটি একপ্রকার ব্যবসায় পরিনত হয়েছে। তিনি ঔষধ নিলেও তাতে যে কোন সুরাহা হয়নি সেকথা স্পষ্টই লিখেছেন।[৩১] রাজলক্ষ্মী দেবী জন্মগ্রহণ করেন ব্রাহ্ম পরিবারে। বিয়ের পর সিলেট ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় প্রথম মহিলা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সত্তর বছর বয়সে বৈধব্য অবস্থায় কেদারনাথ, বদরিনাথ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তবে তীর্থস্থানে দেহত্যাগের ইচ্ছায় যে এই ভ্রমণ এমন বলা যায় না। কারন পরের বছরই তিনি 'নেপালের পথে' নামক ভ্রমণ কাহিনী লেখেন।[৩২] বরং এই ধরনের ভ্রমণের সময় জাতপাত মানা যে অনুচিত তা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রয়াগ ছাড়াও হরিদ্বার কুম্ভযোগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। জয়ন্তী ভট্টাচার্য স্বামীর সাথে এই সময় হরিদ্বারে গিয়েছিলেন। যা ১৯৪৬ সালে 'ভরিয়া লইতে কুম্ভ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[৩৩]

উপসংহার - ভ্রমণ ও অবসর-বিনোদন :

উনিশ শতকের মধ্যভাগ অবদি সমাজে মর্যাদার প্রতীক ছিল কঠোরভাবে পর্দা মেনে অন্তঃপুরে নারীর অবস্থান। তবে এর পর থেকে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাবধারার প্রভাবে সমাজে মর্যাদার সংজ্ঞা বদলে যেতে থাকে। সভ্যতার মাপকাঠিতে আধুনিক হয়ে ওঠার লক্ষ্যে নারী শিক্ষা ও তাঁর সফল বাস্তবায়নে সীমিত পরিসরে হলেও পর্দা সরিয়ে অন্তঃপুর থেকে বাইরে আনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে মহিলাদের চৌকাঠ পেরানো কেবল শিক্ষা লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহন ছাড়াও বৃহত্তর জগতকে দেখার ইচ্ছায় ভ্রমণে বেরাতে শুরু করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহিলাদের বাইরে বেরানোর সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। শেষ জীবনে পুণ্যলাভের, গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায় সাধারণত কাশী বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ (১৮৬৪ সাল) থেকে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে এই ধারনা বদলে যেতে থাকে। তাঁরা কাশীলাভের আশায় ভক্তিভাবের বদলে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কাশীকে দেখছেন। বিশেষত বিধবারা কাশিপ্রাপ্তির আশায় জীবনের অন্তিম লগ্নে যাচ্ছেন এমনও নয়। সামাজিক আচারের বেড়াজালে বৈধব্য মানেই যে জীবন শেষ চিরাচরিত এই ধারনা থেকে বেরিয়ে আসছেন যা তাদের ভ্রমণ বৃতান্ত থেকে ফুটে ওঠে। তাইতো রমাসুন্দরীর কাশী বর্ণনায় প্রতি ছত্রে ফুটে উঠে সেখানকার অব্যবস্থা, আচারের বাড়াবাড়ির সমালোচনা, যা সমকালীন পুরুষ ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় অনুপস্থিত। রমাসুন্দরীর মানসিকতা অন্যান্য ভ্রমণকারী মহিলাদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বরং তাঁরা আশেপাশের প্রাকৃতিক শোভায় বেশী খুশি। কাশী ছাড়াও প্রয়াগ ছিল অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। সাধারণত কুম্ভযোগের সময়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শাহীস্নানের মাধ্যমে পুণ্যলাভের জন্য যেতেন। কিন্তু নতুন মহিলারা যেমন স্বর্ণকুমারী দেবীর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল তাই তিনি পূজার ছুটিতে প্রয়াগে বেড়াতে যান। আবার পুন্য অর্জনের জন্য পান্ডাদের কিছু দিয়ে মাথা মুড়িয়ে সঙ্গমে স্নানের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন এত সহজে তিনি পাপমুক্ত হবেন না। হিন্দুদের কাছে তীর্থ স্থান বলতে সচরাচর কাশি-বারানসী পরিচিত ছিল। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে ওঠে। ফলত দেওঘর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, রামেশ্বর, চিত্রকূট, কেদারনাথ, বদরিনাথ প্রভৃতি স্থানগুলিতে যাতায়াত শুরু করেন। সার্বিকভাবে মহিলাদের এই ভ্রমণের চরিত্র বদলে যাচ্ছে- তীর্থ ভ্রমণ থেকে বেড়ানোর আনন্দে বেরিয়ে পড়া। বেড়ানোর আনন্দ বলতে অবসর যাপনের প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। অবসর বলতে বোঝায় এমন এক 'স্বাধীন সময়' যখন ব্যক্তি নিজের মতো করে সেসময়কে উপভোগ করতে পারবে।[৩৪] কিন্তু পুরুষদের কাজকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মূল্যায়িত করা যায় তাই তাঁরা স্বাধীন সময় উপভোগ করতে পারলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে সে সুযোগ তেমন নেই। ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে মহিলাদের পেশাক্ষেত্রে অংশগ্রহণের উদাহরণ অতি সামান্য। তাছাড়া তাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সাংসারিক দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে মহিলারা উপলব্ধি করতে শুরু করেন সংসারের বাইরেও জীবনের ভিন্ন অর্থ রয়েছে।[৩৫] এবং মহিলারা তা অর্জনের চেষ্টা করেন সামজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় মহিলারা তাদের চাকুরীজীবী স্বামীর ছুটি, অথবা পুজার ছুটি তথা অবসর সময়ে এই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন। তাঁরা তীর্থক্ষেত্রে যাচ্ছেন ঠিকই তবে পুণ্যলাভের জন্য একেবারে অন্ধ ভক্তিভাবে বিলীন হয়ে পড়ছেন এমন নয়। কেউ বা বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে গিয়ে দর্শনীয় জায়গাগুলির মধ্যে মন্দিরও দেখছেন। অনেকে শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে, ভ্রমণ কাহিনীতে যে কথা পড়েছেন তা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। সর্বপরি মন্দিরের আকর্ষণকে ছাপিয়ে গিয়েছে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা। এভাবে মহিলাদের কাছে ধর্মস্থানের সংজ্ঞা ও সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য বদলে যেতে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

Reference:

১. বোভোয়ার, সিমোন দ্য, দ্বিতীয় লিঙ্গ. ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১৮৩-২০৯

২. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ. কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃ. ১৩-২০

৩. Girish Chandra Ghose. 1972. "Female Occupation in Bengal", Bela Dutta Gupta (ed.) Sociology in India, Kolkatta: Progressive Publishers, Appendix V, pp. 52-63

৪. দেব, চিত্রা, অন্তঃপুরের আত্মকথা. কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২৩, পৃ. ২২

৫. মুস্তাফী, নগেন্দ্রবালা. 'অবরোধে হীনাবস্থা', বামাবোধিনী পত্রিকা, ৫ম খন্ড, ৪র্থ ভাগ, ৩৬৪ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০২, পৃ. ৩০-৩১

৬. শ্রীমতী রাসসুন্দরী, আমার জীবন. কলকাতাঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ,২০১১, পৃ. ৪২-৪৩

৭. Johnson, w. George, The Stranger in India or Three years in Calcutta. London: Henry Colburn Publisher, Vol. I, 1843, p. 240-241

৮. চক্রবর্তী, অরিন্দম, 'ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন বারানসীর বাঙালীরা', রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই মার্চ, ২০২৪

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা. কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৭, পৃ. ২,
Borthwick, Meridith, The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905. Princeton: Princeton University Press, 1984, p. 6

১০. মিত্র, স্মৃতি, বড়ো বাড়ির ছোটো স্মৃতি. কলকাতা, থীমা, ২০২৪, পৃ. ৯৬

১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী অখণ্ড উপন্যাস সমগ্র, "বিষবৃক্ষঃ অন্বেষণ". কলকাতা, মৌসুমী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 465 - 474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ২৫৮-২৫৯
১২. মহিলা, "বঙ্গীয় গৃহিনীদের নিত্যকার্য", ৯ম সংখ্যা, ৯ম ভাগ, চৈত্র, ১৩১০, পৃ. ২৩৯-২৪১
১৩. মুরশিদ, গোলাম, নারী প্রগতি আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী. কলকাতাঃ নয়া উদ্যোগ, ২০০০, পৃ. ৫৫-৬৪
১৪. মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭৫.
১৫. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, আমাদিগের ভ্রমণ বৃতান্ত ১ম খন্ড. কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০১৬, পৃ. ১৩
১৬. শ্রীমতী মায়াসুন্দরী, "নারীজন্ম কি অধর্ম্ম!", বঙ্গমহিলা, ১ম খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১২৮২, পৃ.৯৩-৯৪
১৭. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.৮১-৮২, ২০৮
১৮. দেবী (বসু), শ্রী লক্ষ্মীমণি. "বিদেশ ভ্রমণ" বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ- আষাঢ় ১২৭৭, দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৬
১৯. দেবী, প্রিয়ম্বদা. "বারানসী" ভারতী, ২৪ তম খন্ড, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩০৭, পৃ. ৪৯৯-৫১২
২০. দেবী, স্বর্ণকুমারী. "প্রয়াগ" ভারতী, ১০ম খন্ড, ১২৯৩, পৃ. ৮, ৮৫, ১৫৭, ২০২
২১. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, বাঙালী নারীর ভ্রমণকাহিনি. হরপ্পা লিখন ও চিত্রণ ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টো. ২০২৩. কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, পৃ. ১৫১
২২. অজানা "বনবাসিনীর পত্র : বনযাত্রার বিবরণ" বামাবোধিনী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৬, পৃ.৩৬৫-৩৬৭
২৩. দেবী, প্রসন্নময়ী, আর্য্যাবর্তে বঙ্গমহিলাঃ প্রথম ভাগ, দময়ন্তী দাশগুপ্ত, আমাদিগের ভ্রমণ বৃতান্ত ২য় খন্ড. কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৭, পৃ.৩২১-৩৮৪
২৪. দেবী, গিরিবালা, "মহানদী বক্ষে" ভারতী, ভাদ্র-পৌষ, ১৩০১, পৃ. ৫৩০-৫৩৫
২৫. দাস, অম্বুজা সুন্দরী, "চন্দনতলার চাপ" বামাবোধিনী, ৪১৫ সংখ্যা, ৬ষ্ট-ক, ৪র্থ ভাগ, শ্রাবণ ১৩০৬, পৃ. ১১৬, ১৪১
২৬. দেবী, হিরণ্ময়ী, "বান্দেলের গির্জ্জা" ভারতী ও বালক, দ্বাদশ খন্ড, পৌষ ১২৯৫, পৃ. ৫০০-৫০৫
২৭. দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী, "দেওঘর" ভারতী, ভাদ্র ১৩০৯, দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭-১৪৮
২৮. দেবী, বনলতা, "জ্বালামুখী" অন্তঃপুর, শ্রাবনবোক্ত, দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭
২৯. দত্ত, নীলিমাপ্রভা. "দ্বারকার পথে" ভারতবর্ষ, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম খন্ড ১৩৩৪, আষাঢ়-অগ্রহায়ন, পৃ. ৯৯০-৯৩, পঞ্চদশ বর্ষ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৫-১৩৮
৩০. দেবী, নিরূপমা, "তীর্থকামীর পত্র" ভারতবর্ষ, ২১তম বর্ষ, ১ম খন্ড, ১৩৪০, আষাঢ়-অগ্রহায়ন, পৃ. ৫৮, ২১৫
৩১. দেবী, রাধারানী, "চিত্রকূট". ভারতবর্ষ, ২১তম বর্ষ, ২য় খন্ড, পৌষ ১৩৪০, জৈষ্ঠ্য ১৩৪১, পৃ. ৫১৩
৩২. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, বাঙালী নারীর ভ্রমণকাহিনি. হরপ্পা লিখন ও চিত্রণ ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টো. ২০২৩. কলকাতাঃ অক্ষর প্রকাশনী, পৃ. ১৫৫
৩৩. দাশগুপ্ত, দময়ন্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
৩৪. Burke, Peter. "The Invention of Leisure in Early Modern Europe." Past & Present, no. 146, 1995, pp. 136–50. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/651154. Accessed 29 May 2024
৩৫. Ray, Bharati. "Women of Bengal: Transformation in Ideas and Ideals, 1900-1947." Social Scientist, vol. 19, no. 5/6, 1991, pp. 3–23. JSTOR, https://doi.org/10.2307/3517870. Accessed 29 May 2024